Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফ্যামিলি 'ল'(পরিবার আইন) ও আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমি ইসলাম

রোলঃ 23100120080

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ফ্যামিলি 'ল'(পরিবার আইন) ও আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ।

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমি ইসলাম

রোলঃ 23100120080

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ফ্যামিলি 'ল'(পরিবার আইন) ও আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ। " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমি ইসলাম, আইডিঃ 23100120080 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ফ্যামিলি 'ল'(পরিবার আইন) ও আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ। " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুমি ইসলাম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সুমি ইসলাম

আইডিঃ 23100120080

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১।ভূমিকা 5

২।বিয়ে.....6

৩।বিয়ের কিছু সুন্নাত.....7

৪।বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর মতামত:.....10

৫।বিয়ের সঠিক সময়.....12

৬।কুরআনের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবনের শিক্ষা.....18

৭।যৌথ পরিবার না একক পরিবার.....20

৮।আধুনিক সমাজে দাম্পত্য সংকট.....22

৯।আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত.....24

১০।সন্তান আল্লাহর নিয়ামত : চাই যথাযথ তালীম-তারবিয়াত.....26

১১।ট্রান্সজেন্ডার বা এলজিবিটি ইস্যু : বর্তমানে পিতামাতার জন্য এক ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ...30

১২। আধুনিক সমাজের নতুন চ্যালেঞ্জ-.....33

১৩। অবৈধ সম্পর্ক, খেয়ানত ও প্রতারণা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার 38

১৪। নারী-নির্যাতন ও নেশা-আসক্তি : ইসলামের দৃষ্টিতে কারণ, প্রতিকার ও করণীয়.....43

১৫। তালাক ও ডিভোর্স : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, কারণ, প্রভাব ও সমাধান 47

১৬।ইসলামী দৃষ্টিকোণে সামাজিক স্থিতিশীলতা: সামাজিক সচেতনতা, আইনি সংস্কার এবং পারিবারিক কাউন্সেলিংয়ের ভূমিকা 52

১৭। ইসলামে রিজিকের ধারণা.....57

১৮।ইসলামে দুনিয়া, দুনিয়াবিমুখতা ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য: পুঁজি ও পুঁজিবাদ প্রসঙ্গ।....60

উপসংহার.....62

১।ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রদান করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর, যিনি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার বাস্তব শিক্ষা প্রদান করেছেন।

পরিবার মানব সমাজের প্রাথমিক ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান। একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য সুস্থ পারিবারিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। ইসলাম পারিবারিক জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

(সূরা আর-রূম: ২১)

অর্থ: "আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"

এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পরিবার শুধু সামাজিক বন্ধন নয় বরং এটি আল্লাহ প্রদত্ত এক শান্তি ও রহমতের ব্যবস্থা।

হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবার গঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন—

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

(তিরমিজি, হাদিস: ৩৮৯৫)

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম; আর আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।"

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে পারিবারিক জীবনকে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার ভিত্তিতে গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরিবার মানব সমাজের সবচেয়ে প্রাচীন ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান। একটি সুস্থ সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো সুস্থ পরিবার। পরিবারে শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক দায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য পারিবারিক আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলাম পরিবারকে শুধু সামাজিক বন্ধন হিসেবে নয়, বরং একটি দায়িত্বশীল ও নৈতিক ব্যবস্থাপনা হিসেবে দেখেছে। আধুনিক যুগে প্রযুক্তি, নগরায়ন এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে পারিবারিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

২।বিয়ে

বিয়ের বন্ধন জান্নাতের বন্ধন: যেহেতু আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর বিয়ে

জান্নাতেই হয়েছিল। সমস্ত নবীদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিয়ে। বিয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে।

'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিয়ে করা কর্তব্য, কেননা বিয়ে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণকারী, ইন্টারকোর্স অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী।' (মিশকাত)

'হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারাই স্ত্রীর অধিকার আদায়ে সামর্থ্য রাখে, তারা যেন অবশ্যই বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়।' (বুখারী)

'যখন কোনো বান্দা বিবাহ করল, তখন সে তার ঈমানের অর্ধাংশ পূর্ণ করল।' (মিশকাত)

'বিয়ে আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে করো। কেননা আমি উম্মতের সংখ্যা নিয়ে হাশরের মাঠে গর্ব করব।' (ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৮৪৬)

কোরআনে বিয়ে সম্পর্কে:

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা রুম: আয়াত ২১)

"তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (স্বামীগণ) তাদের পোশাকস্বরূপ।" (সূরা বাকারা: আয়াত ১৮৭)

৩।বিয়ের কিছু সুন্নাত

১. বিয়েতে যথাসম্ভব খরচকে সীমিত রাখতে হবে। যেই বিয়েতে খরচ কম, সেই বিয়ে সবচেয়ে উত্তম। বিয়েকে অপচয়, অপব্যয়, বেপর্দা ও বিজাতীয় সংস্কৃতি এবং যৌতুক ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

২. দেনমোহর নগদ হওয়া চাই। দেনমোহর বেশি দেওয়া কখনোই মেয়ের নিরাপত্তার গ্যারান্টি হতে পারে না। ছেলের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু নগদ দিতে পারে ততটুকুই দেনমোহর হওয়া চাই। (সুনানে আবু দাউদ: ২১০৬)

৩. পাত্রের জন্য পাত্রী দেখে নেয়া মুস্তাহাব। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটা করে পাত্রী দেখানোর নামে যে বেপর্দা প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এগুলো সুন্নাতের পরিপন্থী ও পরিত্যাজ্য। (সহীহ বুখারী, শামেলা-৫০৯০, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/২০০)

অন্যদিকে অনেকেই বিয়ের আগে পাত্রী না দেখাকে বুজুর্গি মনে করে, কিন্তু একটা মুস্তাহাব আমলকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে বিয়ের পর অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। পাত্রীর কোনো ছবি ছেলের পরিবারকে দেওয়া শরীয়তসম্মত নয় বলেই অধিকাংশ আলেম মত দিয়েছেন। কারণ ছবি দেখার ক্ষেত্রে ছেলে ছাড়াও অন্য কোনো গায়রে

মাহরাম দেখে ফেলার আশঙ্কা থাকে। অন্যদিকে অযথা পাত্রের ছবি চাওয়াও ঠিক হবে না।

৪. জুমার দিনে মসজিদে বিবাহ সম্পাদন করা সুন্নাত। উল্লেখ্য, যে কোনো দিন বিবাহ করা জায়েজ আছে। (সহীহ মুসলিম: ১৪২৩, সুনানে বায়হাকী: ১৪৬৯৯, ফাতহুল কাদির: ৩/১৮৯)

৫. বিবাহের অনুষ্ঠান বলতে একটিই অনুষ্ঠান হবে। সেটি হলো ওয়ালিমা। লাইলাতুল হায়াতের (প্রথম রাত) পর ওয়ালিমা করা সুন্নাত। ওয়ালিমা ছেলেপক্ষ থেকে হতে হবে। সর্বনিম্ন একটি বকরি দিয়ে ওয়ালিমার কথা হাদীসে এসেছে- (সহীহ বুখারী: ২০৪৮)। মেয়েপক্ষ থেকে কোনো অনুষ্ঠান ইসলামে নেই। অন্যদিকে মেয়েদের উপর চাপিয়ে দিয়ে বরের পক্ষ থেকে শত শত লোক বরযাত্রী হয়ে মেয়েদের বাড়ি যাওয়ার যে প্রচলন আমাদের দেশে রয়েছে এটা নিঃসন্দেহে বিদআত এবং মেয়েদের পরিবারের উপর বিরাট জুলুম।

৬. কনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের শর্ত করা নিষেধ, তবে মোহর অবশ্যই চাইতে হবে। কেননা এটা মেয়ের হক। অন্যদিকে, ছেলের পক্ষ থেকে যৌতুক চাওয়াও সুস্পষ্টভাবে হারাম। (আহসানুল ফাতাওয়া-৫/১৩)

৭. বিয়ে পড়ানোর সময় কনের অনুমতি নিতে গিয়ে সাক্ষী রাখার কোনো প্রয়োজন নাই। আর বিয়েতে যতক্ষণ পর্যন্ত মেয়ের কোনো মাহরাম উপস্থিত থাকে (যেমন: বাবা, ভাই) ততক্ষণ পর্যন্ত, মাহরাম নয় এমন কাউকে উকিল বানিয়ে মেয়ের কাছে ইজাব/কবুল শোনার জন্য যাওয়া শরীয়তসম্মত নয়। অন্যদিকে ইসলামে উকিল বাপ বলে কিছু নেই। উকিল বাপ বিষয়ক যত প্রথা রয়েছে, যেখানে উকিল বাপকে আপন বাবার মতো মাহরাম মনে করা হয়, এগুলো সম্পূর্ণ বিদআত ও হারাম। (আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু: ৯/২৭২৬, কিতাবুল নাওয়াযিল: ৮/১৩৯)

অন্যদিকে ঢালাওভাবে ছেলের পক্ষের লোক ইজাব/কবুল শুনতে যাওয়া অনর্থক এবং বেপর্দাহিনতা। তাই আমাদের সকলকে এমন ঘৃণিত পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। (সহীহ মুসলিম, শামেলা: ১৪২১)

৮. শর্তারোপ করে বরযাত্রীর নামে বরের সাথে অধিক সংখ্যাক লোকজন নিয়ে যাওয়া এবং কনের বাড়িতে মেহমান হয়ে কনের পিতার উপর বোঝা সৃষ্টি করা আজকের সমাজের একটি জঘন্য কুপ্রথা, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। (মুসনাদে আহমাদ: ২০৭২২, সহীহ বুখারী: ২৬৯৭)

বিবাহের সর্বনিম্ন মোহর

বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মোহরের পরিমাণ হলো ১০ দিরহাম। যা প্রায় ৩ ভরি রুপার সমতুল্য। ধরা যাক যদি রুপার মূল্য প্রতি ভরি বা তোলা ১০৫০ টাকা হয় তবে হিসাব অনুয়ায়ী, ৩×১০৫০= ৩১৫০ টাকা।

বি.দ্র সোনা/রুপার মূল্য সোনার দোকান থেকে জেনে নিতে হবে

মোহরে ফাতেমী

মোহরে ফাতেমী সুন্নাত নয়, অনেকে উত্তম বলেছেন। বরং সামর্থ্য অনুযায়ী মোহর ধার্য করাই সুন্নাত।

মোহরে ফাতেমী হলো ৫০০ দিরহাম। যা প্রায় ১৩২ ভরি রুপার সমতুল্য।

রুপার মূল্য বাজার অনুযায়ী কমবেশি হয়। ধরা যাক যদি রুপার মূল্য প্রতি ভরি বা তোলা ১০৫০ টাকা হয় তবে সেই হিসাবে:

মোহরে ফাতেমী ১৩২ ভরি রুপার সমতুল্য বা তার সমমূল্য।

১৩২×১০৫০=১,৩৮,৬০০ টাকা।

৪।বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর মতামত:

নারীর সম্মতি ছাড়া বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নারীবাদের কিছু কিছু বিষয় ইসলামের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই কোন মুসলমানের উচিত হবে না নারীবাদকে সমর্থন করা। সহজ ভাষায় নারীবাদের লক্ষ্য হল নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং পুরুষতন্ত্রের অবসায়ন। কিন্তু ইসলামের বিধানে সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এবং পরিবারের নেতৃত্ব পুরুষের হাতে দেয়া হয়েছে। ইসলাম পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলেছে। কোন নারী নবী বা রসূলের নাম কোরআনে নেই। ইসলামের কোন খলিফার পদ কোন নারী কখনও গ্রহণ করেনি। রসূল (সা) কোন নারীকে বিচারক বা গভর্নর পদে নিয়োগ দেননি কখনও।

পুরুষগণ নারীদের রক্ষক এবং প্রতিপালক এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের এককে অন্যের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে। ফলে পুণ্যবান স্ত্রীরা অনুগত থাকে এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে তারা তা (অর্থাৎ তাদের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ) সংরক্ষণ করে যা আল্লাহ সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন। যদি তাদের মধ্যে অবাধ্যতার সম্ভাবনা দেখতে পাও, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদের সাথে শয্যা বন্ধ কর এবং তাদেরকে (সঙ্গতভাবে) প্রহার কর (হাল্কা), অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহলেতাদের উপর নির্যাতনের বাহানা খোঁজ করো না, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা নিসা-৩৪)

উপরের আয়াত থেকে দেখা যাচ্ছে যে পরিবারের কর্তা হল পুরুষ। আয় রোজগারের বাধ্যবাধকতা পুরুষের উপর। নারী মুলত গৃহস্থালির কাজ এবং সন্তান পালনের কাজ করবে। তবে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে সে বাইরে কাজ করতেও পারে। পুরুষকেও গৃহস্থালির কাজে এবং সন্তান প্রতিপালনে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে সেটা পুরুষের মূল কাজ না।

সূরা বাকারা ২৮২ নং আয়াতের অংশ বিশেষ;

'যদি কর্জ-গ্রহীতা স্বল্প-বুদ্ধি অথবা দুর্বল কিংবা লেখার বিষয়বস্তু বলতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক যেন লেখার বিষয়বস্তু ন্যায্যভাবে বলে দেয় এবং তোমাদের আপন পুরুষ লোকের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ, যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী লোক, যাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে তোমরা রাজী আছ, এটা এজন্য যে, যদি একজন ভুলে যায় (বা ভুল করে) তবে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেবে এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হবে, তখন যেন (সাক্ষ্য দিতে) অস্বীকার না করে।'

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান হল দুই জন নারীর সাক্ষ্য কারণ নারীরা ভুলে যেতে পারে বা ভুল করতে পারে।

নারীবাদের অনেক রকম ফের আছে। এদের অনেকে মনে করে পুরুষ যে পোশাক পড়তে পারে নারীও সেটা পড়তে পারে। কিন্তু এগুলি ইসলামের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।প্রকৃতপক্ষে ইসলাম নারীর মর্যাদা এবং অধিকার নিশ্চিত করেছে কিন্তু কিছু কাজ বা দায়িত্ব শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এগুলি ছাড়া ইসলামে নারী এবং পুরুষের অধিকার সমান। আত্মিক উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়েও পরহেজগার হতে পারে। নারী এবং পুরুষের শারীরিক এবং মানসিক গঠনে পার্থক্য আছে। এই কারণেই আল্লাহ হেকমতের সাথে এই ধরণের নির্দেশনা দিয়েছেন। বলা হয়েছে মায়ের পায়ের নীচেই সন্তানের বেহেশত। সন্তানের উপরে মায়ের অধিকার বাবার চেয়ে ৩ গুণ বেশী। পৃথিবীতে নারী পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। কোরআনে একে অন্যের পোশাক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নারী বিদ্বেষ ভালো না আবার পুরুষ বিদ্বেষও ভালো না। এটা ইসলামের শিক্ষা না। নারী, পুরুষ মিলেই সমাজকে সুন্দর করতে হবে যার যার সঠিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে।

৫।বিয়ের সঠিক সময়

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত-

তিনি বলেন, 'কোনো এক সময় রাসুলুল্লাহ-এর সাথে আমরা বের হলাম।

আমরা ছিলাম যুবক। (বিয়ের খরচ বহনের মতো) আর্থিক সামর্থ্য আমাদের ছিল না [১]।' রাসূল বললেন, "হে যুব সমাজ! [২] তোমাদের বিয়ে করা উচিত। কেননা, এটা দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখে। আর তোমাদের যে লোকের বিয়ের সামর্থ্য নেই [৩] সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সিয়াম তার যৌনশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।"[১]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলছেন-

وَانْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও [৪] এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয় [৫], তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে [৩] যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। শখ

রাসূলুল্লাহ বলেন-

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهِ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجُهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ فَزَهُ فَزَهُ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيْهِ

'তোমাদের মধ্যে যার কোনো (পুত্র বা কন্যা) সন্তান জন্ম হয় সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়; যখন সে বালেগ অর্থাৎ

সাবালক/সাবালিকা হয় [৬], তখন যেন তার বিয়ে দেয়; যদি সে বালেগ হয় এবং তার বিয়ে না দেয় তাহলে সে কোনো পাপ করলে উক্ত পাপের দায়ভার তার পিতার উপর বর্তাবে।[৭]

ইসলাম হলো ফিতরাতের বিধান; মানবসত্তার জন্য যা যথোপযুক্ত এবং যা মানা সম্ভব, তাই বিধান করে দিয়েছে ইসলাম। এজন্য বিয়ের ব্যাপারে স্পষ্ট বয়স উল্লেখ না করে ইসলাম কয়েকটা শর্ত দিয়ে দিয়েছে। এবং সেই শর্তগুলো অর্জন করার জন্য আশপাশের লোকদের দায়িত্ব দিয়েছে, একা ছেলেটার উপর ছেড়ে দেয়নি। উপরের তিনটা টেক্সট লক্ষ করলে যে পয়েন্টগুলো উঠে আসে-
[১] সামর্থ্যবান যুবকের বিয়ে করে ফেলা উচিত।
[২] যুবসমাজ বলতে এখানে কাদের বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে ইমাম নববী (রহ.) লিখেছেন, 'আমাদের লোকদের মতে, যুবক-যুবতী বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা বালেগ হয়েছে এবং ৩০ বছর বয়স পার হয়ে যায়নি। অর্থাৎ নবীজি রাফলি ১৩/১৪/১৫ থেকে নিয়ে ৩০-এর মধ্যে অবিবাহিত থাকাকে পছন্দ করেননি।
[৩] যার সামর্থ্য একেবারেই নেই, তার রোযা রাখা দরকার; সামর্থ্য একটা শর্ত। শর্ত পুরা না হলে রোজা।
[১] বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, ১১/১৩৭ [৮২৯৯]। সনদ দুর্বল।
[২] মাসিক আল-কাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর পর্বের সূত্রে।
ছেলে এবং মেয়ে-উভয়ের বালেগ হওয়ার বয়সসীমা ও আলামত শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে। কোনো ছেলে বা মেয়ের মধ্যে বালেগ হওয়ার নির্দিষ্ট আলামত পাওয়া গেলে বা নির্দিষ্ট বয়সসীমায় সে পৌঁছে গেলেই তাকে বালেগ গণ্য করা হবে এবং তখন থেকেই শরীয়তের হুকুম-আহকাম তার উপর প্রযোজ্য হবে। ছেলেদের বালেগ হওয়ার আলামত হলো: ক) স্বপ্নদোষ হওয়া। খ) বীর্যপাত হওয়া। আর মেয়েদের বালেগ হওয়ার আলামত হলো: ক) স্বপ্নদোষ হওয়া। খ) হায়েয (ঋতুস্রাব) আসা। গ) গর্ভধারণ করা। বালেগ হওয়ার এই নির্দিষ্ট আলামত যদি কোনো ছেলে বা মেয়ের মধ্যে পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে উভয়ের বয়স যখন হিজরী বর্ষ হিসাবে ১৫ বছর পূর্ণ হবে তখন প্রত্যেককে বালেগ বলে গণ্য করা হবে এবং ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর কোনো আলামত পাওয়া না গেলেও সে বালেগ বলেই বিবেচিত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, কোনো ছেলে বা মেয়ের সাথে শরয়ী পর্দা করার হুকুম প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সীমাবদ্ধ নয়। যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে থাকে। বরং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যখন কোনো ছেলের নারী-পুরুষ সম্পর্কিত বিষয়ে বোঝার বয়স হয়ে যায় তখন থেকেই তার সাথে পর্দা করতে হবে। আর মেয়েদের পর্দার বয়স শুরু হয় তার শরীরে মেয়েলী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হওয়ার সময় থেকেই। যখন তাকে দেখলে কোনো পুরুষ আকর্ষণ অনুভব করে। পিতা-মাতার কর্তব্য হলো এমন-বয়সী ছেলেমেয়েদের পর্দার ব্যাপারে সচেতন থাকা।

-আল-ইনায়া শারহুল হেদায়া: ৮/২০১; আদ্দুররুল মুখতার ৬/১৫৩; তাফসীরু কুরতুবী:

১২/১৫১

[৩]http://www.ihadis.com/books/bukhari/chapter/67 তে ৫০৬৬ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যা।

একটা শর্ত। শর্ত পুরা না হলে রোযা।

[৪] অবিবাহিতদের বিয়ে দেয়া সমাজের দায়িত্ব, সুতরাং, আবশ্যিকভাবে সামর্থ্যহীনকে বিয়ের শর্ত 'সামর্থ্য'-এর ব্যবস্থা করে দেয়াও-মানে, শর্ত পূরণের ব্যবস্থা করাও-সমাজের দায়িত্ব। ইসলাম একটা কংক্রিট সমাজের কথা বলে, যার দায়িত্ব অনেক। বর্তমান রাষ্ট্রচিন্তার অনেক কনসেপ্ট ইসলামী সমাজের উপর বর্তায়।

[৫] ন্যূনতম সামর্থ্য হলেই বিয়ে দিয়ে দেবে সমাজ। বাকিটুকু আল্লাহ দেখবেন।

[৬] বালেগ হলে (ছেলেদের স্বপ্নদোষ, মেয়েদের মাসিক ও দৈহিক পরিবর্তন, কোনো কিছু প্রকাশ না পেলে ১৫ বছর বয়স) পিতার দায়িত্ব বিয়ে দেয়া, যদি পিতার সামর্থ্য থাকে সন্তানকে সামর্থ্যবান করে দেয়ার। বালেগ হলে তাকে দ্রুত সামর্থ্যবান হবার শর্ত পূরণ করতে সাহায্য করবেন পিতা, এবং শর্ত পূরণ করে বিয়ে দেবেন। পিতা না পারলে সমাজ তাকে শর্ত পুরা করতে সাহায্য করবে।

[৭] দেরি করলে সন্তানের গুনাহের দায়ভার পিতার উপর বর্তাবে। এমন সতর্কবাণীও এসেছে।

সবগুলো সামনে নিলে আমরা বুঝতে পারি, ইসলাম দ্রুত বিয়েকে বাধ্য করেনি-যেমনটা অনেকে বলে থাকেন। তবে বালেগ হবার পর দ্রুত সামর্থ্য অর্জন করে বিয়ে করতে উৎসাহিত করেছে, এবং সেজন্য সমাজ ও পরিবারকেও দায়িত্ব দিয়েছে। যত দ্রুত সামর্থ্য অর্জন সম্ভব ও সামর্থ্য অর্জনের পর যত দ্রুত সম্ভব। নির্দিষ্ট না করে

একটা রেঞ্জ বলে দিয়েছে ইসলাম-এর মধ্যে অবিবাহিত থাকা যাবে না। একই সাথে ইসলাম এই দুই শর্ত পুরা না হলে বিয়ে দেয়া যাবে না, তাও বলেনি। বালেগ বা বালেগা (তথা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে) হবার আগেও বিয়ে সম্পাদিত হতে পারে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য। কেননা পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার কারণে ক্ষেত্রবিশেষে আগে দেয়া লাগতেও পারে, যেমন-
বিয়ের সঠিক সময়
মুমূর্ষু পিতা নাবালিকা মেয়েকে কারো দায়িত্বে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দুনিয়া থেকে যেতে চান।
দরিদ্র পিতা সমাজের প্রভাবশালীদের কুদৃষ্টি থেকে মেয়েকে রক্ষা করতে চান। বিয়ে দিয়ে অন্য এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন।
দারিদ্র্যের কারণে কন্যার ভরণপোষণ দিতে না পারা। যেটা আমাদের দেশে মূল কারণ হিসেবে প্রস্ফুটিত।
সন্তান বিগড়ে যাবার ভয়ে। ইত্যাদি।
প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তারা একসাথে না থাকতে চাইলে তারও রাস্তা আছে (খিয়ারে বুলুগ-এর বিধান)।। বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী যেটা দ্রুত, ইসলাম সেটার নির্দেশ করেছে। এজন্যই পরিস্থিতি-সাপেক্ষে বিয়ে কারো জন্য ফরয, কারো জন্য সুন্নাহ, কারো জন্য মুস্তাহাব, কারও জন্য মুবাহ, এমনকি কারও জন্য হারাম। এটা নির্ণিত হয় ব্যক্তির অবস্থা সাপেক্ষে। ঢালাওভাবে বাল্যবিবাহ অবৈধ করাটা যেমন সমাধান নয়, বিশেষত আমাদের মতো 'গরীব-অধ্যুষিত' 'নারীর জন্য অনিরাপদ' দেশে; আবার ১৫/১৬/১৭ বছর বয়সী কিংবা পর্নোগ্রাফি ও বলিউডি সংস্কৃতির মাঝে বড় হয়ে সব বুঝে ফেলে যৌন চাহিদা তৈরি হয়েছে যাদের, তাদেরকে জোর করে নাদান শিশুর কাতারে ঢুকিয়ে দেয়াও বাস্তবসম্মত নয়। সেই সাথে গণহারে নাবালেগ বা সদ্য বালেগদের বিয়ে দিতে জোরাজুরি করাও সমাধান নয়। সমাধান দিয়েছে ইসলামই, পরিস্থিতি-সাপেক্ষে যেটা প্রযোজ্য, আলিমদের পরামর্শে সেটা করা। বিস্তারিত জানতে জাস্টিস আল্লামা তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ রচিত 'বাল্যবিবাহ ও বিয়ের বয়স : ইসলামী শরীয়ত বনাম আইয়ূব খানের আইন' আর্টিকেলটি পড়া যেতে পারে। খি
তাছাড়া ইসলাম বিয়েকে সহজ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] (নাবালেগ/নাবালেগা বয়সে বিয়ের পর) যখন ছেলে এবং মেয়ে বালেগ/বালেগা হয়ে যাবে, তখন তারা যদি মুখে একথা বলে দেয় যে, 'আমরা এ বিয়েতে সম্মত নই' তাহলেই (নাবালেগ বয়সে তাদের কৃত) ঐ বিয়ে (শরয়ী দৃষ্টিতে) ছিন্ন হয়ে যাবে। 'বাল্যবিবাহ ও বিয়ের বয়স: ইসলামী শরীয়ত বনাম আইয়ূব খানের আইন', জাস্টিস আল্লামা তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ

[২] বাল্যবিবাহ ও বিয়ের বয়স: ইসলামী শরীয়ত বনাম আইয়ূব খানের আইন http://islamic-cul-ture.faith/ইসলামে-বাল্যবিবাহ-ও-বিয়ে/

ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

'সর্বোত্তম বিবাহ হচ্ছে যেটা সহজে সম্পন্ন হয়।' [১]

'যে বিবাহে খরচ কম, তা-ই বেশি বরকতপূর্ণ।' [২]

'যে সমাজে বিয়ে কঠিন হয়, সেই সমাজে ব্যভিচার সহজ হয়ে যায়।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সর্বোত্তম মোহরানা হচ্ছে-সহজসাধ্য মোহরানা।।০)

ছেলেপক্ষ

মেয়েপক্ষ

সামর্থ্যের মধ্যে মোহর [৪]

যৌতুক নেই।

লৌকিকতা-বর্জিত ওয়ালীমা। ওয়ালীমা ছেলেপক্ষের, মেয়েপক্ষের দায় নেই।

বরযাত্রী নেই।

বাগদান, পানচিনি, গায়ে হলুদের মতো অপচয় বিবর্জিত।

কতটা সহজ করা হয়েছে তা বুঝাতে মাসিক আল-কাউসারে প্রকাশিত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম রচিত প্রবন্ধের কিছু অংশ আপনাদের খিদমতে তুলে দিচ্ছি-[]

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম: ২১১৭; মুস্তাদরাকু হাকিম, হাদীস-ক্রম: ২৭৪২

[২] শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদীস-ক্রম: ৬৫৬৬

[৩] বাইহাকী, হাদীস-ক্রম: ১৪৭২১

[৪] ইমাম শাফিয়ী এ বলেছেন, বিয়ের জন্য কোনো লোকের নিকটে যদি মোহর আদায়ের মতো কিছু না থাকে এবং যদি সে কোনো নারীকে কুরআনের কোনো সুরার বিনিময়ে বিয়ে করে তবে তা জায়িয হবে। তার কর্তব্য হবে ঐ মহিলাকে

সরাটি শিখিয়ে দেয়া। হানাফী মতে এবং আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, বিয়ে জায়িষ হবে ঠিকই, কিন্তু তাকে 'মাহরে মিছিল' পরিশোধ করতে হবে। 'মাহরে মিছিল' হলো পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের যে মোহরে বিয়ে হয়েছে, তার সমতুল্য। [আল-হিদায়া ইফা.. গণ্ড ২, পৃষ্ঠা-ক্রম: ৪২] উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেন, 'সাবধান! তোমরা নারীদের মোহরানা উচ্চহারে বাড়িয়ে
দিয়ো না। [ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম: ১৮৮৭] [৫] ইসলামে মধ্যপন্থা ও পরিমিতিবোধের গুরুত্ব, মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, আল-কাউসার, নভেম্বর ২০১৩

...সুতরাং এর জন্য খুব বেশি আচার-বিচার, উদ্যোগ-আয়োজন ও জাঁকজমকের দরকার হয় না। নেই কঠিন কোনো শর্ত ও দুর্ভর ব্যয়ের ঝক্কি। খরচ বলতে কেবল স্ত্রীর মোহর। আর আচার-অনুষ্ঠান বলতে কেবল সাক্ষীদের সামনে বর-কনের পক্ষ হতে ইজাব-কবুল। ব্যস, এতটুকুতেই বিবাহ হয়ে যায়। অতপর ওয়ালীমা করা সুন্নত ও পুণ্যের কাজ বটে, কিন্তু বিবাহ সিদ্ধ হওয়ার জন্য তা শর্ত নয়। এ ছাড়া প্রচলিত কিছু কাজ কেবলই জায়েয পর্যায়ের। তা করা না করা সমান। করলেও কোনো অসুবিধা নেই, না করলেও দোষ নেই। কেননা বিবাহ শুদ্ধ হওয়া-না হওয়া কিংবা উত্তম-অনুত্তম হওয়ার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। উভয় পক্ষের জন্য এতটাই সহজ করা হয়েছে যাতে সমাজ ও বাবার পক্ষে পাত্রকে দ্রুত সামর্থ্যবান করা এবং পাত্র নিজেকে সামর্থ্যবান মনে করা সহজ হয়।

৬।কুরআনের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবনের শিক্ষা

মানুষের জীবনে দাম্পত্য সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বন্ধন। ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে শুধু পার্থিব প্রয়োজন হিসেবে দেখেনি; বরং এটিকে শান্তি, ভালোবাসা ও নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। কুরআন মাজিদে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচরণ, দায়িত্ব ও পারিবারিক জীবনের নানা দিক সম্পর্কে সুন্দর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

১. দাম্পত্য জীবনের মূল উদ্দেশ্য : শান্তি ও ভালোবাসা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"

— (সূরা আর-রূম : ২১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তি হলো মানসিক প্রশান্তি, ভালোবাসা ও পারস্পরিক মমতা। সংসার তখনই সুখী হয় যখন উভয়ের মাঝে আন্তরিকতা ও সহানুভূতি থাকে।

২. স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক।"

— (সূরা আল-বাকারা : ১৮৭)

এখানে 'পোশাক' শব্দের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের নিরাপত্তা, সম্মান ও সৌন্দর্যের কারণ। তারা পরস্পরের দুর্বলতা গোপন রাখে এবং বিপদে সহযোগিতা করে।

৩. উত্তম আচরণ ও দায়িত্ব পালন

আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন—

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।"

— (সূরা আন-নিসা : ১৯)

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পারস্পরিক সম্মান ও দায়িত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিবারের শান্তির জন্য উভয়েরই উচিত ধৈর্য, নম্রতা ও সহানুভূতির পরিচয় দেওয়া।

৪. নেক সন্তান গঠনে পারিবারিক ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানাও।”

— (সূরা আল-ফুরকান : ৭৪)

এই দোআ থেকে বোঝা যায়, একজন মুসলিম পরিবার শুধু নিজের সুখের জন্য নয়; বরং আদর্শ ও দ্বীনদার প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যেও কাজ করে।

৫. বিবাহের প্রতি উৎসাহ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিবাহ সম্পন্ন করো... তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব দূর করে দেবেন।”

— (সূরা আন-নূর : ৩২)

ইসলাম বিবাহকে সহজ করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ বিবাহ মানুষকে পাপ ও অনৈতিক কাজ থেকে রক্ষা করে এবং সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

৭।যৌথ পরিবার না একক পরিবার

আমাদের উপমহাদেশে যৌথ পরিবারের প্রচলন বহু পুরোনো। ধারণা করা হয়, প্রাচীন গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা থেকেই যৌথ পরিবারের সূচনা হয়েছে। একসময় একই ছাদের নিচে বাবা-মা, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজন মিলে বসবাস করাই ছিল স্বাভাবিক বিষয়। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে যৌথ ও একক—উভয় পারিবারিক ব্যবস্থারই ভালো ও খারাপ দিক সামনে এসেছে।

যৌথ পরিবারের ইতিবাচক দিক

যৌথ পরিবারে একসাথে থাকার কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। ভাই-বোন ও আত্মীয়দের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছোটরা ছোটবেলা থেকেই সামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে, ফলে তাদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সহনশীলতার গুণ তৈরি হয়।

এছাড়া দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করা সহজ হয়। বিপদ-আপদে মানুষ নিজেকে একা মনে করে না। কোনো সমস্যায় দ্রুত পরামর্শ পাওয়া যায় এবং ছোট ছোট আনন্দও সবাই মিলে বড় করে উপভোগ করা যায়। শিশুদের মানসিক বিকাশেও যৌথ পরিবার ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

যৌথ পরিবারের নেতিবাচক দিক

যদিও যৌথ পরিবারের অনেক উপকারিতা রয়েছে, তবুও এর কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। একসাথে থাকার কারণে একজনের আচরণে অন্যজন কষ্ট পেতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের খারাপ আচরণ অন্যদের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে।

অনেক সময় হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত ও পরনিন্দার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দেয়, যা কখনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সময় ও পারস্পরিক বোঝাপড়াতেও বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

বর্তমান সমাজ বাস্তবতা

যৌথ পরিবারের সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে প্রয়োজন পারস্পরিক সম্মান, সহনশীলতা, দায়িত্ববোধ ও একে অপরের হক সম্পর্কে সচেতনতা। কিন্তু বর্তমান সমাজে এসব গুণের অভাব দেখা যায়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের ইতিবাচক দিকের চেয়ে নেতিবাচক দিক বেশি প্রকাশ পায়।

এ কারণে অনেক আলেমের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পৃথক বা একক পরিবারে থাকা অনেক সময় উত্তম হতে পারে। কারণ ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে আলাদা হওয়ার চেয়ে শুরু থেকেই পৃথকভাবে সংসার গড়া অধিক শান্তিপূর্ণ। তবে আলাদা থাকলেও আত্মীয়তার সম্পর্ক ও পারিবারিক দায়িত্ব বজায় রাখা জরুরি।

পৃথক সংসার ও মা-বাবার খেদমত

একক পরিবারে বসবাস করলেও মা-বাবার দায়িত্ব ভুলে যাওয়া যাবে না। যদি বাবা-মা বয়স্ক হন এবং তাদের সেবাযত্নের প্রয়োজন হয়, তাহলে সন্তানের কর্তব্য তাদের খেদমত করা। প্রয়োজনে নিজে অথবা অন্যের মাধ্যমে তাদের সেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

তবে ইসলামী দৃষ্টিতে স্ত্রীর ওপর শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত বাধ্যতামূলক নয়। এটি মূলত সন্তানের দায়িত্ব। যদিও ভালোবাসা, সৌজন্য ও উত্তম চরিত্রের কারণে অনেক স্ত্রী স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালন করেন, যা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

৮।আধুনিক সমাজে দাম্পত্য সংকট

দাম্পত্য জীবন মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মাধ্যমে একটি সুন্দর পরিবার গড়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক সমাজে নানা কারণে দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন ও সংকট দেখা দিচ্ছে। কর্মব্যস্ত জীবন, প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার, অর্থনৈতিক চাপ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবের ফলে আজ দাম্পত্য সংকট একটি বড় সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

দাম্পত্য সংকটের কারণ

আধুনিক সমাজে দাম্পত্য সংকটের পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. যোগাযোগের অভাব

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খোলামেলা আলোচনা না থাকলে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। একে অপরকে সময় না দেওয়া এবং মনের কথা প্রকাশ না করার ফলে সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ে।

২. প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মোবাইল ফোনের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি মানুষের বাস্তব সম্পর্ককে দুর্বল করে তুলছে। পরিবারে একসাথে সময় কাটানোর পরিবর্তে মানুষ ভার্চুয়াল জগতে বেশি সময় ব্যয় করছে।

৩. অর্থনৈতিক ও কর্মজীবনের চাপ

কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যস্ততা ও আর্থিক সমস্যার কারণে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়। এই চাপ অনেক সময় দাম্পত্য জীবনে ঝগড়া ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪. অহংবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

বর্তমান সময়ে অনেকেই নিজের মতামতকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং ছাড় দেওয়ার মানসিকতা কমে গেছে। ফলে ছোটখাটো বিষয় নিয়েও বড় ধরনের বিরোধ সৃষ্টি হয়।

৫. পারিবারিক হস্তক্ষেপ

অনেক সময় আত্মীয়স্বজন বা পরিবারের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এতে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শান্তি নষ্ট হয়।

৬. পরকীয়া ও অবিশ্বাস

দাম্পত্য সম্পর্কে বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরকীয়া ও সন্দেহের কারণে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার ঘটনা দিন দিন বাড়ছে।

দাম্পত্য সংকটের প্রভাব

দাম্পত্য সংকট শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এর প্রভাব পুরো পরিবার ও সমাজের ওপর পড়ে। এর ফলে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়, সন্তানদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং সমাজে বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পায়।

দাম্পত্য সংকট সমাধানের উপায়

১. পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি

স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং সমস্যাগুলো আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

২. একসাথে সময় কাটানো

ব্যস্ততার মাঝেও পরিবারের জন্য সময় বের করা প্রয়োজন। একসাথে ঘুরতে যাওয়া বা সময় কাটানো সম্পর্ককে মজবুত করে।

৩. সম্মান ও সহনশীলতা

দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। ছোটখাটো ভুল ক্ষমা করার মানসিকতা থাকতে হবে।

৪. দায়িত্ব ভাগাভাগি করা

সংসারের কাজ ও দায়িত্ব একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিলে মানসিক চাপ কমে এবং সম্পর্ক ভালো থাকে।

৫. ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা

ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে ধৈর্যশীল ও দায়িত্ববান হতে শেখায়, যা দাম্পত্য সম্পর্ককে সুন্দর রাখতে সাহায্য করে।

৬. বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ

সমস্যা জটিল হলে কাউন্সেলর বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৯।আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে খিয়ানত করো না এবং জেনে-শুনে তোমাদের আমানতের খিয়ানত করো না।”

— সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২৭

সন্তান : আমানত ও পরীক্ষাস্বরূপ

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার জন্য এক মহান আমানত। আল্লাহ তাআলা সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষা ও সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপর অর্পণ করেছেন। তাই সন্তান প্রতিপালনে অবহেলা করা মানে আল্লাহর দেওয়া আমানতের খিয়ানত করা।

একজন সচেতন মুসলিম জানে যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য শুধু খাদ্য, বস্ত্র ও জাগতিক সুযোগ-সুবিধা যথেষ্ট নয়; বরং সন্তানকে নৈতিক, আদর্শিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় গড়ে তোলাও অত্যন্ত জরুরি। যাতে তারা সমাজের একজন উত্তম মানুষ এবং আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে।

সন্তান প্রতিপালন কেবল দুনিয়াবি কল্যাণের জন্য নয়; বরং আখিরাতের সফলতার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। একজন নেক সন্তান পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়ার মতো উপকারী হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“মানুষ জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে দেখে বলবে, ‘হে আমার রব! আমি এই মর্যাদা কীভাবে পেলাম?’ তখন বলা হবে, ‘তোমার সন্তানের তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কারণে।’”

— সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩৬৬০; মুসনাদ আহমাদ

সন্তান প্রতিপালনের পুরস্কার যেমন অনেক বড়, তেমনি এতে অবহেলার শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন। তাই পিতা-মাতাকে সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশের ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন—

“হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। আর যারা এমন করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।”

— সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত: ৯

একজন মুমিন সন্তান থেকে পাওয়া সুখ-দুঃখ সবকিছুর জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে।

সন্তান প্রতিপালন : এক বিরাট দায়িত্ব

সন্তান প্রতিপালন শুধু পিতা বা মাতা হওয়া নয়; বরং এটি একটি সচেতন ও দায়িত্বপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আরেকজন নবাগত মানুষের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতাকে একই সঙ্গে শিক্ষক, পরামর্শদাতা ও উত্তম আদর্শের ভূমিকা পালন করতে হয়। সন্তান পরিবার থেকেই শিক্ষা নেয়—ভালোবাসা, সম্মান, আন্তরিকতা, ধৈর্য ও মানবিকতার শিক্ষা।

পরিবার পৃথিবীর ভেতর একটি ছোট্ট পৃথিবী। এখান থেকেই একটি সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে। নতুন শিশুর জন্মের মাধ্যমে একটি নতুন পারিবারিক অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাই অভিভাবকদের কর্তব্য হলো এমন একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে সন্তানরা দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করতে পারে।

পিতা-মাতা মানুষ হিসেবে ভুল করতেই পারেন। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আল্লাহ তাআলা অবশ্যই পরম দয়ালু। তবে সন্তানের ব্যাপারে সচেতনতা, আন্তরিকতা ও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক অভিভাবকের দায়িত্ব। কারণ সন্তান আল্লাহর দেওয়া এক মহামূল্যবান আমানত।

১০।সন্তান আল্লাহর নিয়ামত : চাই যথাযথ তালীম-তারবিয়াত

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
»أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ«

'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, "আপনারা শিশুদের চুম্বন করেন, কিন্তু আমরা ওদের চুম্বন করি না।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ
"আল্লাহ যদি তোমার হৃদয় হতে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে তোমার উপর আমার কি কোন অধিকার আছে?"

— সহীহ বুখারী, হাদিস : ৫৯৯৮

— সহীহ মুসলিম, হাদিস : ২৩১৭

আল্লাহর নিয়ামত অপরিসীম

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

"তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুনতে শুরু কর, তবে তা গুনে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

— সূরা নাহল : ১৮

বান্দার কর্তব্য হলো আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করা—মুখে এবং কাজে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"যদি তোমরা শোকর কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বেশি দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি অবশ্যই কঠোর।"

— সূরা ইবরাহীম : ৭

তারবিয়াহ কী?

তারবিয়াহ শব্দের অর্থ প্রশিক্ষণ দেওয়া, প্রতিপালন করা, গড়ে তোলা।

"তারবিয়াহ" শব্দটি এসেছে "রব" অর্থাৎ প্রতিপালক থেকে। বাচ্চাদের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে গড়ে তোলাকে তারবিয়াহ বা প্যারেন্টিং বলা হয়।

সন্তান আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত। তাই মুসলিম বাবা-মায়ের দায়িত্ব হলো সন্তানকে দ্বীনের আলোকে গড়ে তোলা।

মুসলিম বাবা-মায়ের দায়িত্ব

বর্তমান সমাজ ফিতনাময়। সুদ, ঘুষ, যিনা, মাদকাসক্তি অহরহ হচ্ছে। তাই আমাদের সন্তানদের ইসলামিক পদ্ধতিতে বড় করতে হবে।

ভাল মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে করণীয়

১। সন্তানকে ভাল মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

২। ভাল আদব-কায়দা শেখাতে হবে।

৩। ইসলামিক পরিবেশসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়াতে হবে।

৪। ভাল ইসলামিক শিক্ষা দিতে হবে।

৫। পোশাক-আশাকে ইসলামের বিধান মানতে শেখাতে হবে।

৬। খাওয়া, ঘুম, গোসল, বাথরুমে যাওয়া ইত্যাদিতে সুন্নাহ অনুসরণ করাতে হবে।

সন্তান আল্লাহর আমানত

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা; আর স্থায়ী সৎকাজ আপনার রবের কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।”

— সূরা কাহাফ : ৪৬

পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।”

— সূরা আত-তাহরীম : ৬

তারবিয়াত শুরু কখন থেকে?

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তানের তারবিয়াত শুরু হয় বিয়ের পূর্ব থেকেই—সঠিক জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার মাধ্যমে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ

“তোমরা শুধু রূপ-সৌন্দর্যের কারণে নারীদের বিবাহ করো না। সম্পদের কারণেও বিবাহ করো না। বরং দ্বীনদারিতা বিবেচনায় বিবাহ করো।”

— সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৫৯

সহবাসের দোআ

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

“যদি কেউ স্ত্রী সহবাসের সময় এই দোআ পড়ে, আর তাদের মাধ্যমে কোনো সন্তান নির্ধারিত হয়, তবে সেই সন্তানের কোনো ক্ষতি শয়তান করতে পারবে না।”

— সহীহ বুখারী : ১৪১

— সহীহ মুসলিম : ১৪৩৪

সন্তানের তারবিয়াতের নিয়ম

১। কালিমা ও দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া

শিশুর কোমল অন্তরে আল্লাহর প্রতি ইয়াকীন সৃষ্টি করতে হবে। তাকে বুঝাতে হবে—সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

২। কুরআন শিক্ষা দেওয়া

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কুরআন শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং কুরআনের শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ শেখাতে হবে।

৩। নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও। আর দশ বছর হলে (সালাত আদায় না করলে) তাদেরকে শাসন কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।”

— সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৫

জরুরি কিছু হিদায়াত

১। শিশুদের কালিমা শিক্ষা দিতে হবে।

২। সালাম, হায়া, পর্দা, সত্যবাদিতা শেখাতে হবে।

৩। ছোটবেলা থেকেই মসজিদে জামাতে নামাজে অভ্যস্ত করতে হবে।

৪। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা থেকে দূরে রাখতে হবে।

৫। গীবত যে গুনাহ তা বুঝাতে হবে।

৬। গরিবদের সাহায্য ও ভাইবোনদের সাথে শেয়ার করা শেখাতে হবে।

৭। সুন্নতি পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত করতে হবে।

সন্তানের দ্বীন শিক্ষা

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। শৈশব শিক্ষার সর্বোত্তম সময়। শিশুদের মন কোমল ও স্বচ্ছ। তাই ছোটবেলা থেকেই ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতে হবে।

উমর ইবনে আবু সালামা (রাঃ) বলেন, একবার খাবারের সময় আমার হাত পাত্রে এদিক-ওদিক ঘুরছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেনঃ

"হে বৎস! বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং নিজের দিক থেকে খাও।"

তিনি বলেন, এরপর থেকে এটি আমার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়।

— সহীহ বুখারী : ৫৩৭৬

— সহীহ মুসলিম : ৫৩৮৮

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

"প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।"

— সহীহ বুখারী : ১৩৫৮

সুতরাং শৈশব থেকেই শিশুর আকীদা, আখলাক ও চরিত্র ইসলামের আলোকে গড়ে তুলতে হবে। দ্বীনি পরিবেশে রাখতে হবে, যাতে তারা ইসলামী আদর্শে বেড়ে উঠতে পারে।

১১।ট্রান্সজেন্ডার বা এলজিবিটি ইস্যু : বর্তমানে পিতামাতার জন্য এক ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ

প্রেক্ষাপট

বর্তমান বিশ্বে পরিবারব্যবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং সন্তানদের মানসিক গঠন নিয়ে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম আলোচিত বিষয় হলো ট্রান্সজেন্ডার ও এলজিবিটি মতাদর্শ। কয়েক বছর আগেও এসব বিষয় পশ্চিমা বিশ্বের সীমিত আলোচনার মধ্যে থাকলেও বর্তমানে এটি বিশ্বব্যাপী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাব্যবস্থা ও গণমাধ্যমের আলোচিত ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাব ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজ এবং পরিবারগুলোর মাঝেও প্রবেশ করছে।

আজ অনেক পিতামাতা উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করছেন যে, সন্তানদের চিন্তাভাবনা, পোশাক, আচরণ, জীবনদৃষ্টি এবং আত্মপরিচয়ের ধারণায় দ্রুত পরিবর্তন আসছে। কোনো ছেলে নিজেকে মেয়ে ভাবছে, আবার কোনো মেয়ে নিজেকে ছেলে হিসেবে পরিচয় দিতে চাচ্ছে। কেউ কেউ সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণকে স্বাভাবিক মনে করছে এবং এটিকে "অধিকার" হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। ফলে পরিবার ও সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ছে।

ট্রান্সজেন্ডার ও এলজিবিটি : ধারণা ও বাস্তবতা

বর্তমান সময়ে "Gender Identity" বা জেন্ডার পরিচয়কে জন্মগত লিঙ্গ থেকে আলাদা করে উপস্থাপন করা হচ্ছে। জন্মগতভাবে কেউ ছেলে বা মেয়ে হলেও সে নিজেকে মানসিকভাবে ভিন্ন পরিচয়ে কল্পনা করতে পারে—এমন ধারণাই আধুনিক ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের ভিত্তি।

এলজিবিটি (LGBT) শব্দটির অর্থ হলো—

Lesbian

Gay

Bisexual

Transgender

পরবর্তীতে এর সাথে আরও বিভিন্ন পরিচয় যুক্ত হয়ে LGBTQ+, Non-binary ইত্যাদি শব্দ চালু হয়েছে। এসব মতাদর্শে জন্মগত নারী-পুরুষ পরিচয়ের পরিবর্তে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ইসলামি বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক দিক

ইসলামে মানুষকে আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট পরিচয় দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ ও নারী—এই স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাই মানবজাতির জন্য নির্ধারিত। কুরআন ও হাদিসে সমকামিতা ও কওমে লুতের ঘটনা কঠোরভাবে নিন্দিত হয়েছে।

ইসলাম মানুষের প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে না; তবে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়। কারও মনে খারাপ চিন্তা বা আকর্ষণ তৈরি হওয়া আর সেটিকে নিজের পরিচয় ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা এক বিষয় নয়। ইসলাম গুনাহকে গুনাহ বলেই বিবেচনা করে, কিন্তু সেটিকে অধিকার বা স্বাভাবিকতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাকে সমর্থন করে না।

কিশোর-কিশোরীদের মাঝে এর বিস্তার

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, কার্টুন ও অনলাইন কনটেন্টের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের লক্ষ্য করে নানা ধরনের মতাদর্শ প্রচার করা হচ্ছে। শিশুদের মনে খুব অল্প বয়স থেকেই জেন্ডার পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিশেষ করে TikTok, Netflix, YouTube, Instagram ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে এমন কনটেন্ট ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যা ধীরে ধীরে সন্তানদের চিন্তা-চেতনায় প্রভাব ফেলছে। ফলে অনেক সন্তান বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

পিতামাতার করণীয়

বর্তমান পরিস্থিতিতে সচেতন পিতামাতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের শুধু ভরণপোষণ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না; বরং তাদের মানসিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বিকাশ নিশ্চিত করাও জরুরি।

১. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করা

শিশুকাল থেকেই সন্তানদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, লজ্জাবোধ, শালীনতা ও পারিবারিক মূল্যবোধ শেখাতে হবে।

২. ডিজিটাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করা

সন্তান কী দেখছে, কার সাথে যোগাযোগ করছে এবং কত সময় অনলাইনে কাটাচ্ছে—এসব বিষয়ে পিতামাতাকে সচেতন থাকতে হবে।

৩. সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা

সন্তান যেন নিজের সমস্যা ও অনুভূতির কথা বাবা-মাকে বলতে পারে, এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

৪. সৎ ও সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করা

ভালো বন্ধু, ভালো পরিবেশ এবং সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা সন্তানদের মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫. পর্নোগ্রাফি থেকে দূরে রাখা

পর্নোগ্রাফি কিশোর-কিশোরীদের মানসিকতা, নৈতিকতা ও আচরণকে ভয়াবহভাবে প্রভাবিত করে। এটি আসক্তি, হতাশা, যৌন বিকৃতি ও সহিংসতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হতে পারে।

পর্নোগ্রাফির ভয়াবহ প্রভাব

গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত পর্নোগ্রাফি দেখা মানুষের মস্তিষ্কে আসক্তির মতো পরিবর্তন তৈরি করতে পারে। এর ফলে—

পড়াশোনায় অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পায়

মানসিক অস্থিরতা ও হতাশা তৈরি হয়

যৌন অপরাধ ও আগ্রাসী আচরণের প্রবণতা বাড়ে

পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল হয়

বিবাহিত জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়

কিশোর বয়সে এসব কনটেন্টের প্রতি আসক্তি ভবিষ্যৎ জীবন ও ক্যারিয়ারের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সন্তান আসক্ত হয়ে পড়ছে কিনা—যেসব লক্ষণে সতর্ক হবেন

সবসময় ফোন বা কম্পিউটারে ডুবে থাকা

পরিবার থেকে দূরে সরে যাওয়া

হঠাৎ মেজাজ পরিবর্তন

রুমে একা থাকতে চাওয়া

মোবাইল সবসময় লুকিয়ে ব্যবহার করা

পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যাওয়া

সামাজিক কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলা

এসব লক্ষণ দেখলেই নিশ্চিতভাবে খারাপ কিছু হয়েছে এমন নয়; তবে পিতামাতার সতর্ক হওয়া জরুরি।

বর্তমান যুগ প্রযুক্তি ও তথ্যের যুগ হলেও এর সাথে নৈতিক ও মানসিক সংকটও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ট্রান্সজেন্ডার ও এলজিবিটি মতাদর্শ, অশ্লীলতা এবং ডিজিটাল মিডিয়ার অপব্যবহার পরিবারব্যবস্থা ও তরুণ প্রজন্মের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পিতামাতাকে সময়োপযোগী সচেতনতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং আন্তরিক ভালোবাসার মাধ্যমে সন্তানদের রক্ষা করতে হবে।
সন্তান শুধু দুনিয়ার সম্পদ নয়; তারা আখিরাতেরও আমানত। তাই তাদের সুস্থ চিন্তা, সুন্দর চরিত্র ও সঠিক বিশ্বাস গঠনে পরিবারকেই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে।

১২। আধুনিক সমাজের নতুন চ্যালেঞ্জ-

প্রযুক্তির অপব্যবহার ও আসক্তি:

বর্তমান যুগ তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা যেমন সহজ ও গতিশীল হয়েছে, তেমনি এর অপব্যবহার সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিজীবনে ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করেছে। অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা, দাওয়াতি কাজ ও সামাজিক সচেতনতা তৈরিতে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
কিন্তু প্রযুক্তির অপব্যবহার বর্তমানে পরিবার ও সমাজের জন্য এক বড় সামাজিক চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার মানুষের মধ্যে আসক্তি সৃষ্টি করছে, যা পারিবারিক বন্ধন দুর্বল করছে, শিক্ষাজীবনে ক্ষতি করছে এবং নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অনেক তরুণ-তরুণী সময়ের অপচয়, অশ্লীলতা, গুজব, সাইবার অপরাধ ও মানসিক অবসাদের শিকার হচ্ছে। ফলে পরিবারে অশান্তি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে।

ইসলাম প্রযুক্তির উপকারী ব্যবহারকে সমর্থন করে, তবে ক্ষতিকর ও হারাম কাজে এর ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। তাই প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নৈতিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পরিচয়

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়া এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে মানুষ খুব সহজে লিখিত, অডিও কিংবা ভিডিও আকারে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। বর্তমান বিশ্বে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার (এক্স), হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক ইত্যাদি সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।

এসব মাধ্যমের সাহায্যে মানুষ শিক্ষা, ব্যবসা, চিকিৎসা, বিনোদন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। অনেক শিক্ষার্থী অনলাইন ক্লাস, টিউটোরিয়াল ও গবেষণামূলক তথ্যের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। ইসলাম প্রচার, কুরআন শিক্ষা ও দাওয়াতি কাজেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

তবে এর অপব্যবহার ভয়াবহ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে। মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যয় করছে, ফলে পরিবার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার

১. সময়ের অপচয়

বর্তমানে মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপ্রয়োজনীয় ভিডিও দেখা, ফেসবুক স্ক্রলিং ও গেমস খেলে সময় নষ্ট করছে। বিশেষ করে তরুণ সমাজ পড়াশোনা ও দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে ভার্চুয়াল জগতে ডুবে যাচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন—

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

“সময়ের কসম, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।”

— (সূরা আল-আসর: ১-২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত— সুস্থতা ও অবসর সময়।”

— (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৪১২)

অতএব সময়ের অপচয় মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য ক্ষতির কারণ।

২. অশ্লীলতা ও নৈতিক অবক্ষয়

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অশ্লীল ছবি, ভিডিও ও অনৈতিক কনটেন্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এসব কনটেন্ট তরুণ সমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

"মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে।"
— (সূরা আন-নূর: ৩০)
ইসলাম চোখের যিনা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনৈতিক কনটেন্ট দেখা ও প্রচার করা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
৩. গুজব ও মিথ্যা তথ্য প্রচার
বর্তমানে যাচাই-বাছাই ছাড়া বিভিন্ন ভুয়া খবর ও অপপ্রচার সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে সমাজে বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা ও পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
"যাচাই ছাড়া সব কথা প্রচার করাই একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"
— (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৯২)
তাই কোনো তথ্য শেয়ার করার আগে সত্যতা যাচাই করা আবশ্যক।
৪. সাইবার অপরাধ ও হ্যাকিং
প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, হ্যাকিং, ব্ল্যাকমেইল ও প্রতারণা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই না বুঝে ব্যক্তিগত ছবি ও তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করে বিপদের সম্মুখীন হয়।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

প্রযুক্তি আসক্তি ও এর প্রভাব

১. শিক্ষাজীবনে নেতিবাচক প্রভাব
সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। তারা বই পড়ার পরিবর্তে মোবাইল নির্ভর হয়ে পড়ছে। ফলে সৃজনশীলতা, গবেষণা ক্ষমতা ও চিন্তাশক্তি কমে যাচ্ছে।

অনেক শিক্ষার্থী রাত জেগে ফেসবুক, ইউটিউব ও গেমসে সময় কাটায়, যার ফলে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা তৈরি হয়।

২. পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হওয়া

প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক কমে যাচ্ছে। একই ঘরে থেকেও সবাই মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফলে পারিবারিক ভালোবাসা, যোগাযোগ ও দায়িত্ববোধ কমে যাচ্ছে।

অনেক সন্তান বাবা-মায়ের সাথে সময় কাটানোর পরিবর্তে ভার্চুয়াল জগতে ডুবে থাকে। এতে পরিবারে দূরত্ব ও মানসিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়।

৩. মানসিক চাপ ও বিষণ্ণতা

অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার উদ্বেগ, হতাশা, ঘুমের সমস্যা ও মানসিক অবসাদের কারণ হতে পারে।

মানুষ অন্যের বিলাসী জীবন দেখে নিজেকে ছোট মনে করে হতাশায় ভোগে। লাইক, কমেন্ট ও ফলোয়ারের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা আত্মসম্মানবোধ কমিয়ে দেয়।

৪. তরুণ সমাজের অধঃপতন

অতিরিক্ত প্রযুক্তি আসক্তি তরুণ সমাজকে কর্মবিমুখ ও দায়িত্বহীন করে তুলছে।

অনেক তরুণ মাদক, অশ্লীলতা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে।

বর্তমানে অনেক কিশোর-কিশোরী অনলাইন সম্পর্ক, অশালীন ভিডিও ও ভার্চুয়াল জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

ইসলামি দৃষ্টিতে প্রযুক্তি ব্যবহার

ইসলাম প্রযুক্তির উপকারী ব্যবহারকে সমর্থন করে। জ্ঞান অর্জন, ইসলাম প্রচার, মানবসেবা ও কল্যাণমূলক কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করা বৈধ ও প্রশংসনীয়।

কিন্তু হারাম, অশ্লীলতা, গিবত, মিথ্যা প্রচার ও সময় অপচয়ের কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

“অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।”

— (তিরমিজি)

ইসলাম আমাদের দৃষ্টি সংযত রাখা, সময়ের সঠিক ব্যবহার করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে করণীয়

১. সময়ের সঠিক ব্যবহার

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় স্ক্রলিং ও ভিডিও দেখা বন্ধ করতে হবে।

২. পরিবারে সচেতনতা বৃদ্ধি

অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর নজর রাখা এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা।

৩. ইসলামি মূল্যবোধ চর্চা

কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ, ইসলামি জ্ঞানচর্চা ও ভালো কাজে সময় ব্যয় করতে হবে।

৪. অশ্লীল ও ক্ষতিকর কনটেন্ট পরিহার

অনৈতিক পেজ, ভিডিও ও কনটেন্ট থেকে দূরে থাকতে হবে।

৫. যাচাই ছাড়া তথ্য প্রচার না করা

কোনো সংবাদ বা তথ্য শেয়ার করার আগে সত্যতা যাচাই করা জরুরি।

৬. আত্মনিয়ন্ত্রণ গড়ে তোলা

প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আত্মসংযম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।”

— (সূরা আন-নাহল: ১২৮)

প্রযুক্তি আধুনিক সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এর সঠিক ব্যবহার মানুষের জীবনকে সহজ, সুন্দর ও উন্নত করতে পারে। কিন্তু অপব্যবহার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

বর্তমানে প্রযুক্তির অপব্যবহার ও সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি পরিবারে অশান্তি, নৈতিক অবক্ষয়, শিক্ষার অবনতি ও মানসিক সংকট সৃষ্টি করছে। তাই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে সচেতন হতে হবে।

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা অনুসরণ করে প্রযুক্তিকে কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে হবে এবং ক্ষতিকর ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। তাহলেই পরিবার ও সমাজকে আধুনিক সামাজিক চ্যালেঞ্জ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

১৩। অবৈধ সম্পর্ক, খেয়ানত ও প্রতারণা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার

মানবসমাজের শান্তি, স্থিতি ও নৈতিকতা রক্ষার জন্য ইসলাম নারী-পুরুষের সম্পর্ককে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বৈবাহিক সম্পর্ককে বৈধ ও পবিত্র ঘোষণা করেছেন এবং এর বাইরে সব ধরনের অনৈতিক সম্পর্ককে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছেন। একইভাবে ইসলাম মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে সততা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। তাই খেয়ানত, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে। বর্তমান সমাজে অবৈধ সম্পর্ক, প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের কারণে পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, সামাজিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে এবং নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্যাগুলোর সমাধানে ইসলামের দিকনির্দেশনা অত্যন্ত কার্যকর ও বাস্তবসম্মত।

অবৈধ সম্পর্কের পরিচয়

নারী-পুরুষের মাঝে আল্লাহ তা'আলা যে বৈধ সম্পর্কের অনুমতি দিয়েছেন, তা হলো বিবাহ। বিবাহের বাইরে প্রেম, অনৈতিক মেলামেশা, গোপন সম্পর্ক, অবাধ বন্ধুত্ব ও যেকোনো ঘনিষ্ঠতা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ সম্পর্ক হিসেবে গণ্য। এ ধরনের সম্পর্ক ধীরে ধীরে মানুষকে যিনা ও ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

"তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ।"

— সূরা আল-ইসরা : ৩২

এ আয়াতে শুধু যিনা নয়; বরং যিনার নিকটবর্তী সব পথ ও উপকরণ থেকেও দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অবৈধ সম্পর্কের ক্ষতিকর প্রভাব

১. নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে

অবৈধ সম্পর্ক মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে দেয়। লজ্জাশীলতা, পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদাবোধ নষ্ট হয়ে যায়। ব্যক্তি ধীরে ধীরে পাপাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

২. পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস করে

এ ধরনের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে এবং পরিবারে অশান্তি বাড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ, পারিবারিক ভাঙন ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

৩. সমাজে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে

অবাধ সম্পর্ক সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বৃদ্ধি করে। তরুণ-তরুণীরা বিভ্রান্ত হয় এবং চারিত্রিক বিপর্যয় দেখা দেয়।

৪. মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে

অবৈধ প্রেমে জড়িত ব্যক্তিরা অধিকাংশ সময় দুশ্চিন্তা, হতাশা ও মানসিক অস্থিরতায় ভোগে। সম্পর্ক ভেঙে গেলে আত্মহত্যা, হতাশা ও অপরাধপ্রবণতা পর্যন্ত দেখা যায়।

৫. আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জিত হয়

অবৈধ সম্পর্ক আল্লাহর নাফরমানির অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে।

অবৈধ সম্পর্ক থেকে বাঁচার উপায়

১. আল্লাহভীতি অর্জন করা

মানুষকে সর্বদা মনে রাখতে হবে, আল্লাহ সবকিছু দেখেন ও জানেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

"তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সঙ্গে আছেন।"

— সূরা আল-মুজাদালা : ৭

আল্লাহর ভয় হৃদয়ে জাগ্রত থাকলে মানুষ গোপনে বা প্রকাশ্যে পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে।

২. দৃষ্টি সংযত রাখা

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ চোখের অপব্যবহার থেকেই অধিকাংশ অবৈধ সম্পর্কের সূচনা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

"মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।"

— সূরা আন-নূর : ৩০

৩. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সতর্কতা

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া অবৈধ সম্পর্কের অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পরিবার ও অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের অনলাইন কার্যক্রমের প্রতি সচেতন নজর রাখা।

৪. ধর্মীয় মূল্যবোধে সন্তানদের গড়ে তোলা

শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ইসলামি শিক্ষা, নৈতিকতা ও লজ্জাশীলতার চর্চা শেখাতে হবে। পরিবারে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে সন্তানরা তাদের সমস্যার কথা সহজে অভিভাবকদের জানাতে পারে।

৫. অশ্লীল সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা

অশ্লীল নাটক, সিনেমা, সিরিয়াল, গল্প ও প্রেমকেন্দ্রিক সাহিত্য মানুষকে অবৈধ সম্পর্কের দিকে আকৃষ্ট করে। তাই এসব থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন।

৬. সময়ের সঠিক ব্যবহার

অলসতা ও কর্মহীনতা মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে। তাই পড়াশোনা, ইবাদত, সমাজসেবা ও সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

৭. কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির করা

আল্লাহর স্মরণ মানুষের হৃদয়কে প্রশান্ত করে এবং পাপ থেকে দূরে রাখে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

"জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।"

— সূরা আর-রা'দ : ২৮

৮. রোযা রাখা

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকদের উদ্দেশে বলেছেন—

"হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা প্রবৃত্তিকে দমন করে।"

— সহীহ বুখারী

৯. তওবা করা

যদি কেউ অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, তবে দ্রুত আল্লাহর কাছে আন্তরিক তওবা করতে হবে এবং সেই সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করতে হবে।

খেয়ানত ও প্রতারণার পরিচয়

খেয়ানত অর্থ বিশ্বাসভঙ্গ করা, আমানতের হক নষ্ট করা কিংবা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। প্রতারণা মানুষের বিশ্বাসকে ধ্বংস করে এবং সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। ইসলামে খেয়ানতকে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক—
আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে এবং ঝগড়া করলে অশ্লীল আচরণ করে।"

— সহীহ বুখারী

খেয়ানত ও প্রতারণার ক্ষতিকর প্রভাব

১. পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট করে

বিশ্বাস মানবসম্পর্কের মূল ভিত্তি। প্রতারণা সেই ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

২. সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে

প্রতারণা বৃদ্ধি পেলে মানুষ একে অপরের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং সমাজে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

৩. ব্যক্তির সম্মান নষ্ট হয়

প্রতারক ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত ও অসম্মানিত হয়।

৪. আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপীকে পছন্দ করেন না।"

— সূরা আন-নিসা : ১০৭

খেয়ানত ও প্রতারণা থেকে মুক্তির উপায়

১. সততা ও আমানতদারিতার শিক্ষা দেওয়া

শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার শিক্ষা দিতে হবে।

২. আল্লাহভীতি অর্জন করা

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ সবকিছু দেখেন। তাই গোপন বা প্রকাশ্যে কোনো ধরনের প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. সৎ মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করা

সৎ ও চরিত্রবান মানুষের সাহচর্য মানুষকে নৈতিকভাবে উন্নত করে এবং অসৎ পথ থেকে দূরে রাখে।

৪. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা

ইসলামে প্রতিশ্রুতি পূরণ করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—সবার সঙ্গে অঙ্গীকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকতে হবে।

৫. আত্মসমালোচনা ও জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করা

প্রত্যেক মানুষকে মনে রাখতে হবে, কিয়ামতের দিন তাকে তার প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

"আর আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত সফল হতে দেন না।"

— সূরা ইউসুফ : ৫২

অবৈধ সম্পর্ক, খেয়ানত ও প্রতারণা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য ভয়াবহ অভিশাপ। এসবের কারণে মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়, পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সমাজে অশান্তি বৃদ্ধি পায়। ইসলাম মানুষকে পবিত্র জীবনযাপন, সততা, বিশ্বস্ততা ও নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহভীতি, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ এবং সৎ চরিত্র গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজকে এসব অনৈতিকতা থেকে রক্ষা করা সম্ভব। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের চরিত্রকে সুন্দর ও পবিত্র করে গড়ে তোলা।

১৪। নারী-নির্যাতন ও নেশা-আসক্তি : ইসলামের দৃষ্টিতে কারণ, প্রতিকার ও করণীয়

ইসলাম নারীকে সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তার সর্বোচ্চ অধিকার প্রদান করেছে। নারী কোনো ভোগ্যপণ্য নয়; বরং তিনি মানবসমাজের এক মহামূল্যবান অংশ। মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যা—প্রত্যেক পরিচয়েই নারী সমাজ ও পরিবার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অথচ আধুনিক সমাজে নারী-নির্যাতন, অবমূল্যায়ন, যৌতুক, পারিবারিক সহিংসতা এবং সামাজিক বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইভাবে নেশা ও মাদকাসক্তি সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করছে। ইসলাম এ দুই সমস্যার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং মানবকল্যাণমূলক সমাধান প্রদান করেছে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে এবং তার অধিকার সংরক্ষণ করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ: “তোমরা নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর।”

— সূরা আন-নিসা : ১৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আনাস (রা.) হতে বর্ণিত—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ أَنْجَشَةُ يَحْدُو بِالنِّسَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ»

অর্থ: “হে আনজাশা! ধীরে চালাও, কারণ নারীরা কাঁচের পাত্রের ন্যায় কোমল।”

— সহীহ বুখারী ৬১৫৯

এই হাদীস নারীর কোমলতা, সংবেদনশীলতা ও মর্যাদার প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

নারী-নির্যাতনের কারণ

১. ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব

আল্লাহভীতি ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে মানুষ নারীর প্রতি সহিংস হয়ে ওঠে।

২. সামাজিক কুসংস্কার

যৌতুকপ্রথা, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও নারীর প্রতি অবহেলা নির্যাতনের অন্যতম কারণ।

৩. পারিবারিক অশান্তি

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব, দারিদ্র্য ও অসচেতনতা পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি করে।

৪. প্রযুক্তির অপব্যবহার

অশ্লীলতা, অবৈধ সম্পর্ক ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করছে।

৫. আইনের দুর্বল প্রয়োগ

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে যথাযথ আইন থাকলেও বাস্তব প্রয়োগে দুর্বলতা দেখা যায়।

নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা

১. আল্লাহভীতি সৃষ্টি

মানুষকে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ সর্বদা তাকে দেখছেন।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।"

— সূরা আন-নিসা : ১

২. নারীর শিক্ষার ব্যবস্থা

নারীদের দ্বীনি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

৩. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

নারীদের বৈধ কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে।

৪. পারিবারিক সহযোগিতা

পরিবারে নারীকে সম্মান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

৫. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি

মিডিয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় সংগঠনগুলোর মাধ্যমে নারী সম্মান বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

৬. নারীর সম্পদের অধিকার নিশ্চিতকরণ

ইসলাম নারীর উত্তরাধিকার ও সম্পদের অধিকার নিশ্চিত করেছে।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

অর্থ: "পুরুষ যা উপার্জন করে তার অংশ আছে এবং নারী যা উপার্জন করে তারও অংশ আছে।"

— সূরা আন-নিসা : ৩২

৭. কন্যাসন্তানের মর্যাদা

রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ

অর্থ: "যে ব্যক্তি দুই কন্যাসন্তানকে লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সঙ্গে এভাবে থাকবে।"

— সহীহ মুসলিম ২৬৩১

নেশা ও মাদকাসক্তি

নেশার পরিচয়

নেশা হলো এমন এক ধ্বংসাত্মক আসক্তি, যা মানুষকে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করে। ইসলাম মাদক ও নেশাকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া ও প্রতিমা অপবিত্র এবং শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর।"

— সূরা আল-মায়িদা : ৯০

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

অর্থ: "প্রত্যেক নেশাজাতীয় বস্তু হারাম।"

— সহীহ মুসলিম ২০০৩

নেশা ও আসক্তির প্রকারভেদ

১. দ্রব্যজাতীয় নেশা

মদ, গাঁজা, ইয়াবা, হেরোইনসহ মাদকদ্রব্যে আসক্ত হওয়া।

২. আচরণগত আসক্তি

মোবাইল, ইন্টারনেট, গেমস, সোশ্যাল মিডিয়া ও অশ্লীল কনটেন্টে অতিরিক্ত আসক্তি।

নেশার ক্ষতিকর প্রভাব

শারীরিক ক্ষতি

লিভার রোগ

হৃদরোগ

ক্যান্সার

মানসিক বিকার

পারিবারিক ক্ষতি

দাম্পত্য কলহ

অর্থনৈতিক সংকট

সন্তানদের অবহেলা

সামাজিক ক্ষতি

চুরি, ডাকাতি ও অপরাধ বৃদ্ধি

নৈতিক অবক্ষয়

সামাজিক অস্থিরতা

নেশা প্রতিরোধে করণীয়

১. ধর্মীয় শিক্ষা ও আল্লাহভীতি

সন্তানদের ছোটবেলা থেকে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা দিতে হবে।

২. পরিবারে সচেতনতা

অভিভাবকদের সন্তানের চলাফেরা ও বন্ধু নির্বাচনের প্রতি নজর রাখতে হবে।

৩. চিকিৎসা ও পুনর্বাসন

মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. ভালো পরিবেশ সৃষ্টি

অসৎ সঙ্গ ও খারাপ পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে হবে।

৫. প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার

ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

৬. নামাজ ও ইবাদতের চর্চা

নিয়মিত নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত ও ইস্তিগফার মানুষকে আত্মিকভাবে শক্তিশালী করে।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ হয়।”

— সূরা আর-রা'দ : ২৮

নারী-নির্যাতন ও নেশা-আসক্তি সমাজের ভয়াবহ ব্যাধি। এ দুই সমস্যা ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রের শান্তি বিনষ্ট করে। ইসলাম নারীকে সম্মান ও নিরাপত্তা দিয়েছে এবং নেশা-মাদক থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাজ গঠন, পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা, নৈতিক শিক্ষা বিস্তার এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই এ সমস্যাগুলোর কার্যকর সমাধান সম্ভব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে নৈতিক ও সুন্দর সমাজ গঠনের তাওফিক দান করুন। আমীন।

১৫। তালাক ও ডিভোর্স : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, কারণ, প্রভাব ও সমাধান

ইসলামে বিবাহ হলো একটি পবিত্র বন্ধন। এটি কেবল জৈবিক বা সামাজিক সম্পর্ক নয়; বরং পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ ও শান্তির বন্ধন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

ًوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً]الروم[٢١ :

অর্থ: "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা রূম, ৩০: ২১)

কিন্তু কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতবিরোধ, কলহ-বিবাদ ও অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তখন সংসার টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় ইসলাম তালাকের অনুমতি দিয়েছে। যদিও তা বৈধ, তথাপি অত্যন্ত অপছন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ُ

অর্থ: "আল্লাহর নিকট বৈধ বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হলো তালাক।" (সুনানে আবূ দাউদ: ২১৭৮)

তালাক ও ডিভোর্স পারিবারিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। একটি সুন্দর সাজানো পরিবার মুহূর্তেই ভেঙে যায়। সন্তানরা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা বাবা-মায়ের স্নেহ, শাসন ও পারিবারিক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হয়। সমাজেও তাদের নানা সংকটের সম্মুখীন হতে হয়।

তবে বাস্তবতা হলো—সব সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সবসময় সম্ভব হয় না। কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেখানে বিচ্ছেদই মঙ্গলজনক হয়ে ওঠে। তখন তালাক একটি শরীয়তসম্মত সামাজিক সমাধান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

]النساء[١٣٠ :

অর্থ: "আর যদি তারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নিসা, ৪: ১৩০)

তালাকের কারণসমূহ

তালাকের পেছনে নানা কারণ কাজ করে। যেমন—

পারস্পরিক অবিশ্বাস

রাগ ও অসহনশীলতা

পরকীয়া ও অবৈধ সম্পর্ক

পরিবারে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ

দ্বীনি অনুশাসনের অভাব

দায়িত্বহীনতা ও নির্যাতন

আর্থিক সংকট

মাদকাসক্তি ও চরিত্রহীনতা

এসব কারণে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয় এবং সম্পর্ক ভাঙনের দিকে ধাবিত হয়।

তালাক থেকে বাঁচার উপায়

১. ধৈর্য ও সংযম অবলম্বন করা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। রাগের সময় একে অপরকে এড়িয়ে চলা এবং কিছু সময় আলাদা থাকা অনেক সময় কার্যকর সমাধান হতে পারে।

আল্লাহ বলেন—

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

]النساء[١٩ :

অর্থ: "তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর।" (সূরা নিসা, ৪: ১৯)

২. সালিশ ও পারিবারিক সমঝোতা

ইসলাম তালাকের আগে উভয় পরিবারের মধ্যস্থতায় সমাধানের চেষ্টা করতে নির্দেশ দিয়েছে।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
]النساء[٣٥ :

অর্থ: "যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তবে একজন সালিশ পুরুষের পরিবার থেকে এবং একজন সালিশ নারীর পরিবার থেকে নিযুক্ত কর।" (সূরা নিসা, ৪: ৩৫)

৩. রাগের মাথায় তালাক না দেওয়া

রাগের বশে তালাক দেওয়া ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ রাগ মানুষের বিবেককে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

لَا تَغْضَبْ

অর্থ: "রাগ করো না।"

(সহীহ বুখারী: ৬১১৬)

তালাক হলে করণীয়

১. সুন্দরভাবে বিদায় দেওয়া

ইসলাম তালাকের সময়ও মানবিকতা ও সৌজন্য বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছে।

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
]البقرة[٢٢٩ :

অর্থ: "হয় উত্তমভাবে রেখে দাও, নয়তো সুন্দরভাবে বিদায় দাও।" (সূরা বাকারা, ২: ২২৯)

২. স্ত্রীর অধিকার আদায় করা

মোহর পরিশোধ করা

ইদ্দতকালে ভরণ-পোষণ দেওয়া

অপবাদ ও কুৎসা রটনা থেকে বিরত থাকা

সন্তানদের দায়িত্ব পালন করা

এসব ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা।

৩. আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা

তালাকের পর হতাশ না হয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে। হয়তো ভবিষ্যতে এর মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ বলেন—

وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

]البقرة[٢١٦ :

অর্থ: "হতে পারে তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ কর, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" (সূরা বাকারা, ২: ২১৬)

তালাকপ্রাপ্ত নারী সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজে অনেক সময় তালাকপ্রাপ্ত নারীকে অবজ্ঞা করা হয়, যা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। তালাক কোনো অভিশাপ নয়; বরং এটি একটি বৈধ সামাজিক সমাধান। তাই তালাকপ্রাপ্ত নারীকে সম্মান ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন—

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

অর্থ: "তোমরা নারীদের ব্যাপারে উত্তম আচরণের উপদেশ গ্রহণ কর।"

(সহীহ বুখারী: ৫১৮৬)

নারীর অধিকার ও মর্যাদা

ইসলাম নারীদের অধিকার সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। নারীকে অবহেলা, নির্যাতন ও অধিকারবঞ্চিত করা জঘন্য অপরাধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল শ্রেণির অধিকার হরণের ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা ঘোষণা করছি—এতিম ও নারী।"

(মুসনাদে আহমাদ: ৯৬৬৬)

আরও ইরশাদ হয়েছে—

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।"

(সুনানে তিরমিযী: ৩৮৯৫)

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয়

১. ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিকতা চর্চা

পরিবারে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা চালু করতে হবে।

২. নারীর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা

আল্লাহ বলেন—

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
]النساء[٧ :

অর্থ: "পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজন যা রেখে যায়, তাতে পুরুষের অংশ আছে এবং নারীরও অংশ আছে।" (সূরা নিসা, ৪: ৭)

৩. নারীশিক্ষা নিশ্চিত করা

শিক্ষিত নারী একটি শিক্ষিত জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. নারী নির্যাতনের বিচার নিশ্চিত করা

নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর সামাজিক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তালাক ও ডিভোর্স ইসলামে বৈধ হলেও তা কখনো কাম্য নয়। ইসলাম সর্বপ্রথম পারিবারিক বন্ধন রক্ষা করতে চায়। কিন্তু যখন সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন মানবিক মর্যাদা ও শান্তি রক্ষার্থে তালাকের পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তালাকের সময়ও ইসলাম সৌজন্য, ন্যায়বিচার ও মানবিকতা বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছে।

তাই পারিবারিক জীবনে ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ইসলামী মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমেই একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ ও পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব।

১৬।ইসলামী দৃষ্টিকোণে সামাজিক স্থিতিশীলতা: সামাজিক সচেতনতা, আইনি সংস্কার এবং পারিবারিক কাউন্সেলিংয়ের ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের প্রতিটি স্তরে শান্তি, ন্যায়বিচার এবং ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামের মূল লক্ষ্য হলো এমন একটি আদর্শ সমাজ গঠন করা, যেখানে নৈতিকতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং আল্লাহভীতি বিদ্যমান থাকবে। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে সামাজিক অবক্ষয়, পারিবারিক অস্থিরতা, নৈতিক মূল্যবোধের সংকট, মাদকাসক্তি, সহিংসতা এবং পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা সমাজকে গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী আইনি সংস্কার এবং পারিবারিক কাউন্সেলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
ইসলাম মানুষকে কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের শিক্ষা দেয় না; বরং সামাজিক দায়িত্ববোধ, পারিবারিক বন্ধন এবং ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিও গুরুত্বারোপ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—
“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা দেবে।”
— (সূরা আলে ইমরান: ১১০)
এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় প্রতিরোধ করা মুসলিম সমাজের অন্যতম দায়িত্ব। তাই একটি সুস্থ, সুন্দর ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনের জন্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক সচেতনতা, কার্যকর আইনব্যবস্থা এবং পারিবারিক সহায়তা ব্যবস্থা অত্যন্ত অপরিহার্য।
২. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি
ক) সামাজিক সচেতনতার ধারণা
ইসলামে সামাজিক সচেতনতা বলতে বোঝায়—সমাজের কল্যাণে কাজ করা, অন্যায় প্রতিরোধ করা এবং পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা বজায় রাখা। ইসলামের পরিভাষায় এটি “আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার”-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ প্রদান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা।

একটি সমাজ তখনই শান্তিপূর্ণ হয়, যখন তার সদস্যরা নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। ইসলাম ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার ও রাষ্ট্র পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সচেতনতা তৈরির উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

খ) দায়িত্ববোধ ও আত্মসচেতনতা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন—

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

— (সহিহ বুখারি) ৩৮৯৫

এই হাদিস ব্যক্তি জীবনে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতার শিক্ষা দেয়। একজন পিতা পরিবারের জন্য দায়িত্বশীল, একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য দায়িত্বশীল এবং রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের জন্য দায়িত্বশীল। এই চেতনা সমাজে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে।

গ) নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন

সামাজিক সচেতনতার মূল ভিত্তি হলো নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্র। ইসলাম মানুষকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহানুভূতি, ধৈর্য ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়। ব্যক্তি যখন নৈতিকভাবে উন্নত হয়, তখন সমাজে অপরাধ, দুর্নীতি ও অবিচার কমে যায়।

ইসলাম পরকালীন জবাবদিহিতার ধারণার মাধ্যমে মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে ব্যক্তি নিজের ভেতর থেকেই অপরাধ ও অনৈতিকতা বর্জনের মানসিকতা তৈরি করে।

ঘ) সচেতনতা সৃষ্টির কার্যকর উপায়

সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেমন—

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উপায়সমূহ:

মসজিদভিত্তিক ইসলামী আলোচনা ও খুতবা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা প্রদান

গণমাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ প্রচার

মাদক ও অপরাধবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পরিবারে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি

তরুণ সমাজকে ইসলামী সংস্কৃতি ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা

এসব উদ্যোগ সমাজকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৩. আইনি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা: ইসলামী আইনের আলোকে

ক) ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য

ইসলামী আইন বা শরিয়তের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইসলামী আইন "মাকাসিদ আশ-শরিয়াহ"-এর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য পাঁচটি বিষয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করা—

মাকাসিদ আশ-শরিয়াহর মৌলিক লক্ষ্যসমূহ:

ধর্মের সুরক্ষা

জীবনের সুরক্ষা

বুদ্ধির সুরক্ষা

বংশের সুরক্ষা

সম্পদের সুরক্ষা

বর্তমান যুগে সামাজিক অপরাধ, প্রযুক্তিনির্ভর প্রতারণা, পারিবারিক সহিংসতা এবং নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক আইনি সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

খ) ইজতিহাদ ও যুগোপযোগী আইনব্যবস্থা

ইসলামী আইন স্থবির নয়; বরং সময় ও পরিস্থিতির আলোকে "ইজতিহাদ" এবং "কিয়াস"-এর মাধ্যমে নতুন সমস্যার সমাধানের সুযোগ রয়েছে। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন জটিল সমস্যা মোকাবিলায় ইসলামী চিন্তাবিদ ও আইনজ্ঞদের গবেষণাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গ) নারীর অধিকার ও পারিবারিক নিরাপত্তা

ইসলাম নারীদের মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং অধিকার নিশ্চিত করেছে। কিন্তু সমাজে এখনও যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নির্যাতন এবং পারিবারিক সহিংসতার মতো সমস্যা বিদ্যমান। এসব প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসনের আলোকে কার্যকর আইন প্রণয়ন ও কঠোর বাস্তবায়ন জরুরি।

প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার:

যৌতুক প্রথা কঠোরভাবে দমন

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ

পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ
নারীর ভরণপোষণ ও উত্তরাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করা
বিবাহ ও তালাক ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা

ঘ) প্রতিরোধমূলক সামাজিক ব্যবস্থা

ইসলাম কেবল শাস্তির আইন দেয়নি; বরং অপরাধের কারণ দূর করার দিকেও গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থা যেমন—যাকাত, সদকা, বায়তুল মাল ইত্যাদির মাধ্যমে দরিদ্রতা দূর করে সামাজিক বৈষম্য কমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেকারত্ব ও সামাজিক অবহেলা অনেক অপরাধের জন্ম দেয়। তাই একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে ইসলামী আইন অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

৪. কাউন্সেলিং ও পারিবারিক সহায়তা: ইসলামী অনুশাসন

ক) পরিবার: সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর

পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি। একটি পরিবার সুস্থ থাকলে সমাজও সুস্থ থাকে। বর্তমান যুগে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে বিবাহবিচ্ছেদ, মানসিক অস্থিরতা, একাকীত্ব এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব সমস্যা সমাধানে পারিবারিক সহায়তা ও কাউন্সেলিং অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

খ) কাউন্সেলিংয়ের গুরুত্ব

ইসলাম পারস্পরিক পরামর্শ, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়। দাম্পত্য জীবনে মতবিরোধ দেখা দিলে তা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

“এবং নারীদের সাথে উত্তম আচরণে জীবনযাপন কর।”

— (সূরা আন নিসা: ১৯)

দাম্পত্য কলহ নিরসনে ইসলাম সালিশ ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থাও প্রদান করেছে। ফলে পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

গ) পারিবারিক সম্প্রীতি ও সন্তান প্রতিপালন

ইসলামে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও সম্মান একটি সুখী পরিবারের মূল ভিত্তি।

সন্তানদের সঠিক ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইসলামী তরবিয়তের মাধ্যমে সন্তানদের নৈতিকতা, শৃঙ্খলা এবং মানবিক মূল্যবোধ শেখানো সম্ভব।

পারিবারিক সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ:

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতা

সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় গড়ে তোলা

পারিবারিক সমস্যা আলোচনা ও সমাধানের অভ্যাস

মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও সহমর্মিতা চর্চা করা

ঘ) ইসলামিক ফ্যামিলি কাউন্সেলিং

বর্তমান যুগে পারিবারিক ভাঙন ও মানসিক সমস্যার সমাধানে ইসলামিক ফ্যামিলি কাউন্সেলিং অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। ইসলামী নীতিমালা ও সুন্নাহভিত্তিক কাউন্সেলিং মানুষকে মানসিক প্রশান্তি প্রদান করে এবং পরিবারকে ভেঙে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

ইসলামী কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে—

দাম্পত্য সম্পর্ক উন্নত হয়

হতাশা ও মানসিক চাপ কমে

পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়

সন্তানদের জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়

সমাজে স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়

একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, কার্যকর আইনি সংস্কার এবং পারিবারিক কাউন্সেলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্র—এই তিন স্তরের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে চায়।

সামাজিক সচেতনতা মানুষকে নৈতিক ও দায়িত্বশীল করে তোলে, আইনি সংস্কার সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং পারিবারিক কাউন্সেলিং পরিবারকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে। ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণ করলে সমাজে অপরাধ, সহিংসতা ও নৈতিক অবক্ষয় অনেকাংশে কমে যায়।

অতএব, ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র যদি সম্মিলিতভাবে ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, ন্যায়ভিত্তিক আইন প্রয়োগ এবং পারিবারিক সহায়তা নিশ্চিত করতে পারে, তবে একটি সুন্দর, স্থিতিশীল ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

১৭। ইসলামে রিজিকের ধারণা

রিজিক মানবজীবনের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ তার জীবনের প্রয়োজন পূরণের জন্য রিজিকের মুখাপেক্ষী। বর্তমান সমাজে সাধারণত রিজিক বলতে অর্থসম্পদ, চাকরি, ব্যবসা বা জীবিকা অর্জনের উপকরণকে বোঝানো হয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে রিজিকের ধারণা এর চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক ও গভীর। ইসলাম রিজিককে কেবল অর্থ বা বস্তুগত সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং মানুষের জীবনের সকল কল্যাণকর বিষয়কে রিজিকের অন্তর্ভুক্ত করেছে। স্বাস্থ্য, মানসিক প্রশান্তি, সুখী পরিবার, নেক সন্তান, জ্ঞান, ঈমান, সম্মান, ভালোবাসা এবং প্রয়োজন পূরণের তাওফিক—এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত রিজিক।

আধুনিক সমাজে মানুষ ক্রমশ অর্থকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। সফলতার মাপকাঠি হিসেবে অর্থ, পদমর্যাদা এবং ভোগ-বিলাসকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে মানুষ মনে করছে অধিক সম্পদ অর্জনই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃত সফলতা কেবল ধন-সম্পদে নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের মধ্যে নিহিত।

ইসলামে রিজিকের প্রকৃত ধারণা

ইসলামী দৃষ্টিতে রিজিক একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও প্রদত্ত। মহান আল্লাহ বলেন—

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾

“তোমাদের রিজিক এবং তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা আকাশে রয়েছে।”

(সূরা আয-যারিয়াত: ২২)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

“পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেননি।”

(সূরা হূদ: ৬)

উপরের আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, রিজিকের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে, কিন্তু সেই চেষ্টা কখনোই রিজিকের নিশ্চয়তা নয়। বরং আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালার মাধ্যমেই মানুষ তার নির্ধারিত রিজিক লাভ করে।

বস্তুগত ও অবস্তুগত রিজিক

ইসলামে রিজিককে কেবল অর্থসম্পদ হিসেবে দেখা হয় না। বরং রিজিকের দুটি দিক রয়েছে—বস্তুগত এবং অবস্তুগত।

বস্তুগত রিজিকের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, অর্থ, ওষুধ, যানবাহন এবং অন্যান্য ভৌত উপকরণ অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে অবস্তুগত রিজিকের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, রোগমুক্তি, তৃপ্তি, সুখ, মানসিক প্রশান্তি, ঈমান, জ্ঞান এবং প্রয়োজন পূরণের সামর্থ্য।

উদাহরণস্বরূপ, ওষুধ একটি বস্তুগত রিজিক; কিন্তু রোগমুক্তি একটি অবস্তুগত রিজিক। একইভাবে খাদ্য বস্তুগত রিজিক হলেও ক্ষুধা মিটে যাওয়া, খাবারে স্বাদ পাওয়া এবং তা থেকে উপকার লাভ করা অবস্তুগত রিজিক। আবার অর্থসম্পদ একটি বস্তুগত রিজিক, কিন্তু সেই সম্পদে বরকত থাকা এবং প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ হওয়া অবস্তুগত রিজিক।

অনেক সময় দেখা যায়, একজন ব্যক্তি বিপুল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও মানসিক অশান্তিতে ভোগে। অন্যদিকে সীমিত সম্পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তি সুখী ও সন্তুষ্ট জীবনযাপন করে। এর কারণ হলো, প্রকৃত কল্যাণ কেবল অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর দেওয়া অবস্তুগত রিজিকের ওপরও নির্ভরশীল।

রিজিক ও আল্লাহর ওপর ভরসা

ইসলাম মানুষকে রিজিকের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখার শিক্ষা দেয়। এই ভরসাকে ইসলামী পরিভাষায় তাওয়াক্কুল বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

»لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ«

“তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথভাবে ভরসা করতে, তবে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিজিক দিতেন যেমন তিনি পাখিদের রিজিক দেন।”

(জামে তিরমিযি, হাদিস: ২৩৪৪)

পাখি সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর ওপর ভরসা মানে কর্মবিমুখ হওয়া নয়; বরং চেষ্টা করার পাশাপাশি আল্লাহর ওপর নির্ভর করা।

তাকওয়া ও রিজিক

ইসলামে তাকওয়াকে রিজিক লাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন—

﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

"যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।"

(সূরা আত-তালাক: ২-৩)

এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তাকওয়া কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যম নয়; বরং দুনিয়াবি কল্যাণ ও রিজিক বৃদ্ধিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

বিবাহ ও রিজিক

আধুনিক সমাজে অনেক মানুষ অর্থনৈতিক অক্ষমতার ভয়ে বিয়ে বিলম্বিত করে। কিন্তু ইসলাম এ বিষয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন—

﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾

"তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন।"

(সূরা আন-নূর: ৩২)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, বিবাহ কেবল পারিবারিক বন্ধন নয়; বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক ও বরকতেরও একটি মাধ্যম হতে পারে।

পারিবারিক জীবনে রিজিকের গুরুত্ব

পারিবারিক আইনের আলোচনায় রিজিক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামে স্বামীর ওপর স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। একইভাবে অসহায় পিতা-মাতার ভরণপোষণও সন্তানের দায়িত্ব। তাই জীবিকা অর্জন কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য নয়; বরং পারিবারিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গেও সম্পৃক্ত।

যখন পরিবারে রিজিক সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পারস্পরিক সহযোগিতা, সন্তুষ্টি এবং দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে অতিরিক্ত ভোগবাদিতা, অর্থলোলুপতা এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তি পারিবারিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি করে।

১৮।ইসলামে দুনিয়া, দুনিয়াবিমুখতা ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য: পুঁজি ও পুঁজিবাদ প্রসঙ্গ।

ইসলাম দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার শিক্ষা দেয় না; বরং দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দেয়। পবিত্র কুরআনে দেখা যায়, "দুনিয়া" এবং "হায়াতুদ দুনিয়া" (পার্থিব জীবন) শব্দদ্বয়ের ব্যবহার ভিন্ন অর্থবহ। সাধারণভাবে কুরআনে "হায়াতুদ দুনিয়া" এমন পার্থিব জীবনকে নির্দেশ করে, যা মানুষকে আখেরাত থেকে গাফেল করে দেয় এবং ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তোমরা জেনে রাখো! পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্বপ্রকাশ, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়।" (সুরা হাদিদ: ২০)

অন্যদিকে কুরআনের বহু আয়াতে দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন।" (সুরা বাকারা: ২০১)

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে না; বরং দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি ও মোহকে নিরুৎসাহিত করে। একজন মুমিন দুনিয়ার সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করবে, কিন্তু সেগুলোকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানাবে না। দুনিয়া থাকবে তার হাতে, কিন্তু হৃদয়ে নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়াবিমুখতা (যুহদ) মানে দারিদ্র্য কিংবা সম্পদহীনতা নয়। বরং প্রকৃত দুনিয়াবিমুখতা হলো সম্পদের মালিক হয়েও তার প্রতি অন্তরগত আসক্তি থেকে মুক্ত থাকা। এ কারণেই বহু সাহাবি বিপুল সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন প্রকৃত জাহেদ। তারা সম্পদকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন।

হযরত উসমান (রা.), আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.), তালহা (রা.) এবং যুবাইর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত ধনী সাহাবি। কিন্তু তাদের সম্পদ তাদেরকে আখেরাত থেকে গাফেল করতে পারেনি। তারা দান-সদকা, ওয়াকফ এবং মানবকল্যাণমূলক কাজে

বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন। ফলে ইসলাম ধনী হওয়াকে নিরুৎসাহিত করে না; বরং সম্পদের সঠিক ব্যবহারকে উৎসাহিত করে।

ইসলামে কর্মজীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি কিংবা অর্থনৈতিক উন্নতি দুনিয়াবিমুখতার পরিপন্থী নয়। একজন মুসলিম ব্যবসায় লাভ করার চেষ্টা করবে, কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করবে, দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং বৈধ উপায়ে অধিক উপার্জনের চেষ্টা করবে। তবে তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতের সফলতা। সে আয় করবে বেশি, কিন্তু ভোগ করবে পরিমিত; অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করবে দান-সদকা ও জনকল্যাণমূলক কাজে।

এই প্রসঙ্গে ইসলাম পুঁজি (Capital) এবং পুঁজিবাদ (Capitalism)-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে। ইসলাম বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন ও ব্যবসার মাধ্যমে মুনাফা করাকে বৈধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" (সুরা বাকারা: ২৭৫)

সুতরাং পুঁজি সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক লাভ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। তবে পুঁজিবাদী মানসিকতা, যেখানে যেকোনো উপায়ে মুনাফা অর্জন, সীমাহীন ভোগবাদ এবং সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রবণতা বিদ্যমান, তা ইসলামের ন্যায়বিচারভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

ইসলাম সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের সীমারেখা মেনে চলার নির্দেশ দেয়। একইভাবে ব্যয়ের ক্ষেত্রেও অপচয়, বিলাসিতা এবং অবৈধ খাতে অর্থ ব্যয়কে নিরুৎসাহিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তোমরা খাও, পান করো; কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।" (সুরা আরাফ: ৩১)

এছাড়া ইসলাম সম্পদের সামাজিক বণ্টনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। জাকাত, সদকা, ওয়াকফ, কুরবানি এবং অন্যান্য আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে সম্পদ সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"যাতে সম্পদ তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" (সুরা হাশর: ৭)

অতএব ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে ব্যক্তি বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করবে, কিন্তু সেই সম্পদের দাসে পরিণত হবে না। সে দুনিয়াকে আখেরাতের প্রস্তুতির ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করবে এবং সম্পদকে

মানবকল্যাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানাবে। এভাবেই ইসলাম দুনিয়া ও আখেরাত, সম্পদ ও তাকওয়া, ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও সামাজিক দায়িত্ববোধের মধ্যে একটি সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করে।

উপসংহার

ইসলামের দৃষ্টিতে রিজিক কেবল অর্থসম্পদ নয়; বরং মানুষের জীবনের সকল কল্যাণকর বিষয়ই রিজিকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলাই রিজিকের প্রকৃত মালিক এবং তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বান্দাদের মধ্যে তা বণ্টন করেন। তাই মুসলমানের দায়িত্ব হলো বৈধ উপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা, তাকওয়া অবলম্বন করা এবং পারিবারিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। আধুনিক সমাজের অর্থকেন্দ্রিক চিন্তাধারার বিপরীতে ইসলামের এই ভারসাম্যপূর্ণ রিজিক-দর্শন ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

উপসংহার

ফ্যামিলি ল বা পারিবারিক আইন মানবজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান, যা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছে এবং পারিবারিক সম্পর্ককে সুন্দর, ভারসাম্যপূর্ণ ও দায়িত্বশীল রাখার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার, সন্তানের অধিকার, নারী-পুরুষের পারস্পরিক দায়িত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক—সব ক্ষেত্রেই ইসলামী পারিবারিক আইন ন্যায়, দয়া ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়।

বর্তমান আধুনিক সমাজে প্রযুক্তির অপব্যবহার, অবৈধ সম্পর্ক, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, নৈতিক অবক্ষয়, নারী-নির্যাতন, মাদকাসক্তি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব পরিবারব্যবস্থাকে দুর্বল করে তুলছে। এর ফলে দাম্পত্য কলহ, ডিভোর্স, সন্তানদের মানসিক সংকট এবং সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়

কেবল আইনি ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়; বরং ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিক শিক্ষা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং ইসলামী আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব বলা যায়, একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য ইসলামী পারিবারিক আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। পরিবারে ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, সহনশীলতা ও আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠা করা গেলে আধুনিক সমাজের বহু সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে। তাই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—সকল পর্যায়ে ইসলামী পারিবারিক আইনের সঠিক চর্চা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সুন্দর ও কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।